অপহৃত আকাঙ্খার রোষে

মখদুম আজম মাশরাফী

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশের মূল সমস্যা। এখন পরিবেষ্টিত ভারতে তার পুনরুত্থান বেশ জনপ্রিয়। সে সাম্প্রদায়িকতা ভারত বিভাজনেরও মূল চালিকা শক্তি ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা কেন? কে একে লালন করে? এ প্রশ্নের গভীরে না গেলে এ সমস্যার সমাধান মিলবে না।

আমাদের উপমহাদেশ আধ্যাত্ম সাধনার দেশ। কৃষ্টি ও ধর্মবোধের সৃজন, সংশ্লেষন ঘটেছে এখানে কাল পরম্পরায়। বিজ্ঞান, বানিজ্য, স্বাস্থ্য, শিল্প ও রাজনীতির আদান প্রদান হয়েছে সারা পৃথিবীর সাথে। কিন্তু একদা দিগ্বিজয়ীর দেশ ক্রমশঃ সংকুচিত হয়েছে বিজিতের দেশে। ধর্ম এখানে রেখে গেছে তার সুগভীর ছাপ, রাজনীতি খেলছে তার চিরপুরাতন খেলা।

ধর্মবিদ্বেষের নির্মম এ ছবিটি তোলা হয়েছে আহমেদাবাদে, গুজরাট - ২০০৪

মূল সনাতন ভারতের উচু-নীচু ভেদের উগ্রসাম্প্রদায়িকতা ভেদ করে প্রবল শক্তিতে অনুপ্রবেশ করে মুসলিম বহিঃশক্তির প্রশাসন। শিল্পকলায়, প্রশাসনে, সমাজবিন্যাসে সে প্রশাসনের সুফল ভারতকে অনেকটা কাল দেয় ভিন্ন সভ্য জীবনের ধারা। এখনও ভারত-সভ্যতা মানে সেই সব স্থাপত্যের উপস্থিতি, সেই প্রশাসনিক কাঠামোর বিবর্তিত আজকের রুপ। পরে বৃটিশ অনুপ্রবেশের ইতিহাস সুখকর ছিল না মোটেও। ভারতীয়দের মাঝে অর্ন্তঘাত সৃষ্টি, ষড়যন্ত্র, কুচক্রের সুড়ঙ্গ পথে ক্ষমতার যাদুদন্ড হস্তগত করে বেনিয়া ইংরেজ। আর ইতিহাসের এই দুঃসময় থেকেই হাজার বছরের সম্প্রীতির ভারতীয়রা বিভক্ত হয়েছে নানান প্রকারে। কখনও ভাষায়, কখনও জাতিতে আবার কখনওবা ধর্মে। আর এ সব গুলিই সম্প্রদায়গত কারন, যে কোন কারনকে কেন্দ্র করে গোষ্টিবদ্ধ হওয়া আর বাকি সবকে উপেক্ষা করাই তো সাম্প্রদায়িকতা। শুধু ধর্মগোষ্ঠিবদ্ধতাকে সাম্প্রদায়িকতা বলবো কেমন করে? অন্য গোষ্ঠির প্রতি ঘৃনা আর নিজ গোষ্ঠিকে অকারন অহংকৃত শ্রেষ্ঠ ভাবার পাগলামী ও ঔদ্ধত্বই তো সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতার মৌল বিষ। কখনও জাতীয়তা, কখনও ধর্ম, কখনও ভাষা, কখনও জাত এই বিষে নিমজ্জিত হয়েছে বারবার।

শিল্প-সংস্কৃতিসেবী মুসলিম শাসকদের থেকে শাসনদন্ড হাতিয়ে নেবার ইতিহাস মনে রেখে ইংরেজ তথাকথিত উচচ বর্নের হিন্দুসমাজকে সুযোগ-সুবিধা সরবরাহের মাধ্যমে নিজ অবস্থানের ভারসাম্য সৃষ্টির পরিকল্পিত কার্য্যক্রম বজায় রেখেছিল দুই শতাব্দিকাল। মূলতঃ ধর্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতার

জন্ম সেখানেই। জাতি, জাতীয়তা, ভাষা ও গোষ্টিগত সাম্প্রদায়িতাকে বোঝা সম্ভব। কিন্তু ধর্মগত সাম্প্রদায়িক সংকীর্নতা দুর্বোধ্য ঠেকে। কারন আসলে সংকীর্নতাই ধর্মবোধের পরিপন্থী।

বাংলায় মুসলিম ধর্মালম্বিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল কয়েক শতাব্দি থেকেই। তবুও উচ্চবর্ন হিন্দুদের জাত ভেদের যে সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু সাধারনের সাথে মুসলমানরাও তার শিকার হয়ে পড়ে । কিন্তু আর্শ্চয্যজনকভাবে ইংরেজদের সঙ্গে সখ্যতায় এই বর্নবাদীদের কোন দ্বিধা ছিল না। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার এমন অধার্মিক নৈতিকতার নজীর আর নেই। শাসক ইংরেজদের সহায়তায় পরিস্থিতি এমন ছিল যে এই অনাচারের সম্পর্কে সচেতনতাই হয়ে উঠতো 'সাম্প্রদায়িকতা'। নিম্নবর্নের হিন্দুসাধারন, খৃষ্টান ও মুসলমানদের নিজ ঘরে পরবাসী এ অবস্থায় অসাম্প্রদায়িক যাঁরা এর বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়াতে চাইতেন তারা ছিলেন দুঃসাহসী। রাজনীতিতে ক্রমশঃ দানা বাঁধে এই বোধ। শিক্ষায় আসে আন্দোলনের ডাক। শিল্প-সংস্কৃতিতে আসে নতুন অভিযান। মুসলিম লীগ, মুসলিম সাহিত্য পরিষদ, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এরকম নানান মঞ্চে সমবেত হতে থাকেন সমমনারা। এ প্রক্রিয়া ছিল সমাজবিজ্ঞানের এক অনিবার্য্য স্বতঃস্ফূর্ততা।

যখন ইরেজদের প্রস্থান অনিবার্য্য হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বদলে দিল পৃথিবীর অবয়ব, বিষাক্ত ইংরেজ মারলো তার শেষ ছোবল। ইংরেজদের সাথে বর্নবাদীদের মিতালীর আগুন খেলার ফলশ্রুতি ছিল মর্মান্তিক। কলকাতা আর নোয়াখালীর দাঙ্গা যাদের স্বরনে আছে সাম্প্রদায়িকতার কদর্য্য চেহারা তারা ভুলতে পারবেন কি করে। সে সময় রক্তে ভেজা পথ ধরে সর্বস্বঃ হারা মুসলমান ও হিন্দুরা নতুন পতাকা উড়িয়ে অতিক্রম করেছিল আপন বুকচেরা সীমান্ত । হাজার বছরের সম্প্রদায়-সম্প্রীতি আর ধর্মবোধের অবসান হল। মানব বসতির ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার বিস্মৃতি অত কি সহজ।

ওরা মুসলিম, ওরা নয় হিন্দু, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পার কর সিন্ধু।
ধর্মদাঙ্গা, গুজরাট - ২০০৪

ঘনকৃষ্ণ অঙ্গারে, কে হিন্দু কে মুসলিম বুঝাই যায়না - চট্টগ্রাম

আমাদের অঞ্চলে সবুজ পতাকার সেই চন্দ্রখচিত আশ্বাস বিলিন হতে দীর্ঘ সময় লাগে নি। এখানে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার ভেতরে ফাটল আনে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা। ভাষা আর সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব পাকিস্তানের ভৌগলিক দুরত্বকে ঠেলে দেয় অসীম দুরত্বে। আমরা দ্বিতীয় মীমাংসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাত্র আড়াই দশকে আরেক রক্তপাতের

আয়োজন করতে বাধ্য হই। প্রানপনে তুলে নেই আরেক রক্তরাঙ্গা পতাকা। এবারে আড়াই দশক আগের প্রথম মীমাংসাকে অবলিলায় ভুলে দ্বিতীয় মীমাংসাকে করে তুলি অমীমাংসিত। যার চক্রে অসহায় শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের দল তীব্রগতিতে ঘুরে চলেছে আরও তিনটি দশক।

এবারে আমরা জাতীয়তা বিষয়ক সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে অবস্থান করে ধর্মবিষয়ক জাতীয়তাকে বল প্রয়োগে নিষিদ্ধ ও অবরুদ্ধ করতে উদ্যত হই। সেই একই জনগনের রক্তপাতময় প্রথম মীমাংসাকে ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চাই জোর করে। যে রাজনীতি এই জনগোষ্ঠির জীবনকে আমূল আলোড়িত করে চলেছে দশক দশক ধরে এখন বলা হচ্ছে রাজনীতি ধর্মীয় জীবন যাপন বিষয়ের সাথে এক নয়, নিরপেক্ষ। যে রাজনীতি, যে ধর্মীয় বঞ্চনার জন্য একদা জীবন ও সর্বস্বঃ পাত করতে হয়েছে, সে রাজনীতি এখন ধর্ম জীবন সম্পর্ককে শক্তি প্রয়োগে নিষেধ আরোপ করছে। মুক্তিযুদ্ধবিজয়ী জাতি যে বঞ্চনা, ভাষা ও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাঁদের আকাঙ্খা ও

মা, শিশু পুড়ে ছাই, ওরা হিন্দু তাই আবদ্ধ ঘরে ওদের শ্মশান হয়েছে। চট্টগ্রাম - ২০০৪

প্রত্যয়কে পরখ না করেই বহিরারোপিত নীতিমালাকে জাতীয় নীতিমালা বলে চাপিয়ে দেবার ভ্রান্তি থেকে যে বিভ্রমের শুরু তাতে নতুন মাত্রা যোগ করে সংস্কৃতিহন্তা ও গনহত্যাকারীদের বিচারহীন সাধারন ক্ষমা। একদিকে গন-আকাঙ্খাকে অগনতান্ত্রিকভাবে উপেক্ষা ও দলন অন্যদিকে ধর্মান্ধদের, খুনীদের পূর্নবাসন ধর্মোম্মাদনাকে প্রশ্রায়িত করে। জাতির হতাশা ও অসন্তোষকে আশ্রয় করে ধর্মান্ধদের নতুন অভিযান। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। সংসদে গনহত্যাকারীদের নির্বাচিত হতে দেখে, কিংবা অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে সরাসরি এদের দলভূক্ত হতে দেখে এ সত্যকে আরও বেশী প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়।

পাটনা ষ্টেশন, বিহার - সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, ইতিহাসের লোমহর্ষক বিভীষিকাময় ধর্মদাঙ্গায় পুরো ষ্টেশন ফাঁকা

এখন এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা শুধু সংর্ঘষকে উৎসাহিত করবে। জাতি বিভক্ত হবে ঘরে ঘরে। জীবন হয়ে উঠবে সন্দিগ্ধ ও দুর্বিসঃহ। এখন যেমনটা চলছে। তাহলে এ থেকে

বেরিয়ে আসার পথ কি? পথ হল প্রকৃত ধর্মকে জীবনের প্রায়োগিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত করা। রাজনীতিতে সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্মানুশীলনের উদারনৈতিক অধিকারকে উৎসাহিত করা। নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহন করে ধর্মকে জনগনের রাজনৈতিক জীবন থেকে পৃথক করে রাখার প্রক্রিয়াকে রহিত করা। এ বোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করা যে ধর্ম মানেই উগ্র সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করা।

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া, জানুয়ারী, ২০০৬

কর্ণফুলী, সিডনি, ২১ জানুয়ারী ২০০৬